

<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَعَدَاؤِي وَعَدَاؤُكُمْ أَوْلِيَاءُ تُلْقُونَ</p> <p>إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَهُمْ مِنَ الْحَقِّ يَخْرُجُونَ لِرَأْسِ</p> <p>وَيْتَانَا كَرَاهًا نُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّنَا مَا لَنَا جِهَادٌ فِي سَبِيلِ وَ</p> <p>أَبْنَاءِ مَرْضَاتٍ يُدْرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا</p> <p>أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ إِن</p> <p>يَتَّقُوكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْتَوْفُوا إِلَيْكُمْ أَلْيَدٍ بِهِمْ وَالسَّلَامَةُ</p> <p>بِالشُّعْرِ وَوَدُّوا أَنْ تَكْفُرُوا ۝ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُهُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ۝</p> <p>يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْضَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ</p> <p>أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لَوْ قَوْمُهُمْ إِنَّا</p> <p>بُرءَاءُ أَوْلِيَانَا وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَكْفَارًا بِكُمْ وَبِآبَائِنَا</p> <p>وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدًّا لَا</p> <p>قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لِمَ تَسْتَعْفِفُونَ لَكَ وَمَا لِي لَكَ مِنَ اللَّهِ</p> <p>مِنْ شَيْءٍ زُيِّنَا عَلَيْكَ تُوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝</p>

সূরা আল-মুমতাহিনা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ১৩

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নামে শুরু।

(১) মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহ ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। (৩) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৪) তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সংস্রীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনা। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যক্তিক্রম। তিনি বলেছিলেন : আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।

জন্যে বৈধ নয় এবং এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্যে বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামাস্তর।

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার উত্তম উত্তম নাম

আছে। কোরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ হাদীসসমূহে ১৯টি নাম বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লেখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ — এই পবিত্রতা ও মহিমা

ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয় ; কেননা, সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও করা অন্তর্নিহিত কারিগরি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহর্নিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তসবীহ পাঠও হতে পারে। কেননা, সুচিন্তিত অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনভূতি সম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে স্রষ্টাকে চেনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। একারণেই কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে : **وَلَكِنْ لَا تَتَّقُونَ تَسْبِيحَهُمْ** — অর্থাৎ, তোমরা তাদের তসবীহ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ : তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) —এর বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সকালে তিন বার **السَّمِيعِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** হُوَ اللَّهُ الْكَلِيمُ থেকে শেষপর্বস্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদদের মতু হাঙ্গল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে। —(মাযহাবী)।

সূরা আল-মুমতাহিনা

এই সূরার শুরুভাগে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযুল : তফসীর কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কাবিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নারী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল : না। আবার জিজ্ঞাসা করা হল : তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তা হলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? সে বলল : আপনারা মক্কার সম্প্রদায় পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে।

আমি খোর বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তুমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বলল : বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাকেররা হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) কাকেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাঙ্কে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতায়্যা (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাকেররা নির্ধাতন চালাত এবং তাদেরকে উতাস্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্ধাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশুঙ্গী ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিংবা ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাকেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-পেলেদের হেফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।—(কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, মহিলাটি এসময়ে রওযায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বোখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে, আবু মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওয়ামকে আদেশ দিলেন, অশুে আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রওযায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের নামে হাতেব ইবনে আবী বালতায়্যার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রাঃ) বলেন : আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) যেস্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সেস্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বলল : আমার কাছে কারও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর জালাশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম : রসূলুল্লাহ

(সঃ)—এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম : হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবশ্র করে দিব।

অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে পায়জামার ভিতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে চলে এলাম। হযরত ওমর (রাঃ) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে আরম্ভ করলেন : এই ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশাসঘাতকতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাকেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।

রসূলুল্লাহ (সঃ) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার ঈমানে এখনও কোন তফাৎ হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির একরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়রা তাদের পরিবার-পরিজনদের হেফাযত করে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) হাতেবের জবানবন্দী শুনে বললেন : সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত ওমর (রাঃ) ঈমানের জোশে নিজে বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ তাআলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্যে জন্মান্তের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরম্ভ করলেন : আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলই আসল সত্য জানেন।—(ইবনে-কাসীর) কোন কোন রেওয়াজে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে ; আমি একাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)—ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা ছেনে পেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিশ্রেঙ্কিতে সূরা মুমতাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াত উপরোক্ত ঘটনার জন্যে হৃদয়ঙ্গর করা হয় এবং কাকেরদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّورَةَ وَهِيَ السُّورَةُ الْمَدْيَنَةُ وَالَّتِي فِيهَا آيَاتٌ كَثِيرٌ مِّنْ آيَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে

বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উল্লেখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, এ ধরনের পত্র কাকেরদেরকে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে কাকের শত্রু বাদ দিয়ে ‘আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু বলে প্রথমতঃ এই নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহর শত্রু কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ নয়। অতএব, এ থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়তঃ এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাকের যে পর্যন্ত কাকের থাকবে, সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহর দূশমন। অতএব, যে মুসলমান আল্লাহ মহব্বত দাবী করে, তার সাথে কাকেরের বন্ধুত্ব ক্রমশে সম্ভবপর ?

وَقَدْ كَفَرَ وَإِيمَانَهُ كَرِهَ مِنَ الْحَيْبِ يُرِيدُونَ الرُّسُولَ وَإِيَّاكَ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ

এখানে حق বলে কোরআন অথবা ইসলাম বোঝানো

হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিস্কার করেছেন। এই বহিস্কারের কারণ কোন পার্শ্বিক বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ঈমানই এর কারণ ছিল। অতএব, একথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মুমিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তা পরিবার-পরিজনদের হেফাজত করবে। তার এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, ঈমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। খোদা না করুন, তোমাদের ঈমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ধোঁকা বৈ নয়।

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حَيَاتَكُمْ فِي سِينَةٍ وَإِيَّتِي مَرْضَاتِي এতেও

ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহর জন্যে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ছিল, তবে আল্লাহর শত্রু কাফেরদের কাছে এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে।

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ

এতেও আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফেরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর রাখেন; যেমন উল্লেখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

إِنْ يَتَّقُونَكَ يَخُوفُونَكَ بِذُنُوبِهِمْ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَافِقُونَ

অর্থাৎ, সুযোগ পাওয়া সঙ্গেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহ ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোন দিকে প্রসারিত হবে না।

وَذُؤَابُواؤُكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ঈমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

لَنْ نَقْعُدَ عَنْكُمْ أَرْحَامَكُمْ وَأُولَئِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْطِلُونَ سَبِيلَكُمْ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ তাআলা সেদিন

এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। সন্তানরা পিতা-মাতার কাছ থেকে ও পিতা-মাতারা সন্তানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওপর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সন্তানদের মহব্বতে তুমি একাজ্জ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর কাছে কোন কিছু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কচ্ছেদই নয়—শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে পর্যন্ত তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে।

حَقِّي تُوْمُوْا بِاللّٰهِ وَحَدَّكَ فَكَانَتْ لَكُمْ اٰمُوَةٌ حَسَنَةً থেকে পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

একটি সন্দেহের জগন্নাভ : উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উত্তম আদর্শ ও সূন্বত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) তার মুশরিক পিতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তওবায় এর উল্লেখ আছে। অতএব, সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করা ইবরাহীমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েয হওয়া উচিত। তাই ইবরাহীমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব বিষয়ে ইবরাহীমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী, কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়।

اَلَا قَوْلِ اِبْرٰهِيْمَ لِرَبِّهٖ اِنَّكَ تَدْعُوْنِيْ لِيَّعْبُدَ اِلٰهًا مَّعًا وَاَنَا اَسْلَمْتُ لِرَبِّىْ وَنَا اَسْلَمْتُ لِرَبِّىْ وَنَا اَسْلَمْتُ لِرَبِّىْ আয়াতের মর্ম তাই। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ওষর সূরা তওবায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া নিষেধাজ্ঞার পূর্বে করেছিলেন, অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে করেছিলেন যে, তার অন্তরে ঈমান বিদ্যমান আছে, কিন্তু পরে যখন জানলেন যে, সে আল্লাহর দুশমন, তখন এবিষয় থেকেও নিজের বিমুখতা ঘোষণা করলেন।

فَاَلَمْ تَرَ اِنَّكَ اَدْعُوْهُ لِيَّعْبُدَ اِلٰهًا مَّعًا وَاَنَا اَسْلَمْتُ لِرَبِّىْ وَنَا اَسْلَمْتُ لِرَبِّىْ আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই।

কোন কোন তফসীরবিদ اَلَا قَوْلِ اِبْرٰهِيْمَ কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, ইবরাহীম (আঃ) যে, পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে গেছে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরূপ করা এখনও জায়েয। কোন কাফের সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে মুসলমান, তবে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায় কোন দোষ নেই।—(কুরতুবী)

মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং শুধু আন্তরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেই নয়; বরং যিস্মী ও চুক্তিবদ্ধ কাকেরদের সাথেও জায়েয নয়। এ থেকে তফসীরে-মাযহরীতে মাসআলা বের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত কাকেরদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো জরুরীই; নিষিদ্ধ নয়। এখেকে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেও জায়েয। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এর জন্যে শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকলে জায়েয নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেকের সাথে সর্বাবস্থায় জরুরী ও ওয়াজিব।

শানে-নুযুলের ঘটনা : আলোচ্য আয়াতগুলোও একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাতহের শুরুতেই এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির যেসব শর্ত ছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি কাকেরদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেয়া হবে না, পরন্তু কাকেরদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাকেরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদের কাকের আত্মীয়রা তাদেরকে প্রত্যর্পণের আবেদন জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হোদায়বিয়ায় অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সূত্রাং এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের নারীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নারীদের ব্যাপারেও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রথমে মুসলমানদের বিবাহিতা ছিল; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মক্কাতেই থেকে যায়। মুসলমান হওয়াই এই নারীদের বেলায় আসল ভিত্তি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) ও মক্কাবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার বিখ্যাত শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদিনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যতঃ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ, কোন মুসলমান পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ফেরত পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হোদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন তখন মুসলমানদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষাতুল্য একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবু জন্দল (রাঃ)-এর। কোরাইশরা তাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তানুযায়ী তাঁকে ফেরত পাঠানো উচিত কিন্তু আমরা আমাদের একজন

নির্ধাতিত ভাইকে যালেমদের হাতে পুনরায় তুলে দিব এটা কিরূপে সম্ভব ?

কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের নীতিমালার হেফাযত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে সাথে তাঁর দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বরই এই নির্ধাতিতদের বিজয়ীসুলভ মুক্তিও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত কারণেই তিনিও আবু জন্দল (রাঃ)-কে ফেরত প্রত্যর্পণে দৃষ্টিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু চুক্তি পালনের খাতিরে তাঁকে বুকিয়ে শুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হল। মুসলমান সাঈদা বিনতে হারেস (রাঃ) কাকের সায়ফী ইবনে আনসারের পত্নী ছিলেন। কোন কোন রেওয়াজেতে সায়ফীর নাম মুসাফির মখযুমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাকেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হোদায়বিয়ায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হামির। সে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে দাবী জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যর্পণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত মেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাকেরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাকেরদের হাতে ফেরত দেয়া হবে না—সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক; যেমন উল্লেখিত সাঈদা অথবা হিজরতের পর তার মুসলমানত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেয়ার কারণ এই যে, সে তার কাকের স্বামীর জন্যে হালাল নয়। তফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটির ব্যাপকতা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়—নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাকের স্বামী মোহরানার আকারে যা কিছু তার পিছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেয়া হবে। এসব আয়াতের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ (সঃ) চুক্তিপত্রের উল্লেখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাঈদা (রাঃ)-কে কাকেরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে-ওতবা মক্কা থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরৎ দানের দাবী জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নাফিল হয়। অন্য এক রেওয়াজেতে আছে, উম্মে কুলসুম আমার ইবনে-আস (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুসলমান ছিল না। উম্মে-কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী উঠে। রসূলুল্লাহ (সঃ) শর্ত অনুযায়ী আমারা ও ওলীদ ভ্রাতৃদ্বয়কে ফেরত পাঠিয়ে দেন; কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেননি। তিনি বললেন : এই

শর্ত পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়াজে বর্ণিত আছে। বলাবাহুল্য এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কুরতুবীর উল্লেখিত রেওয়াজে থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মতে তাতে নারীরা शामिल ছিল না। তাই তিনি হোদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর দৃষ্টিতে ছিল; কিংবা আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এক ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা খতমকরণ রূপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهْجِرَاتٍ فَمَا حَسْبُكُمُ اللَّهُ

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মুমিন হওয়াই সন্ধির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মক্কা থেকে মদীনায আগমনকারিণী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে অথবা মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে বা অন্য কোন পার্শ্বি স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আল্লাহর কাছে এই শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত নয়; বরং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরী। তাই মুসলমানগণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায আসে, তাদের ঈমান পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছে: اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَهُنَّ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদিদৃষ্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুসলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন: মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্রোহ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পার্শ্বি স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি; বরং একান্তভাবে আল্লাহ ও তার রসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে মদীনায বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন।—(কুরতুবী)

তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রাঃ)—এর রেওয়াজে বলা হয়েছে: নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী

আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهْجِرَاتٍ মুহাজির নারীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর হাতে আয়াতে বর্ণিত

বিষয়সমূহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তাদেরকে সেসব বাক্যও উচ্চারণ করানো হত, যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর রেওয়াজে উল্লেখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ দ্বারা তা পূর্ণ করা হত।

وَأَنَّ عِلْمَهُنَّ مِنْ مَوْلَاهُنَّ فَلَا تَرْتَدُّنَّ إِلَى الْكُفَّارِ

অর্থাৎ, পরীক্ষার পর যদি তারা মুমিন প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ নয়।

لَأَهْلُنَّ مِنْ لَهْمِهِمْ وَأَهْلُهُمْ مِنْ لَهْمِهِمْ

অর্থাৎ, এই নারীরা কাফের পুরুষদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফের পুরুষরাও তাদের জন্যে হালাল নয় যে, তাদেরকে পুনর্বিবাহ করবে। এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোন কাফেরের বিবাহধীনে ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফেরের সাথে আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্যে হারাম। নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত রাখার কারণ এটাই।

وَأَلْفَاكُهُنَّ وَأَلْفَاكُهُنَّ

অর্থাৎ, মুহাজির মুসলমান নারীর কাফের স্বামী বিবাহের মোহরানা ইত্যাদি বাবত যা ব্যয় করেছে, তা সবই তার স্বামীকে ফেরত দাও। কেননা, নারীকে ফেরত দেয়াই কেবল সন্ধি-শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্বামীর প্রদত্ত ধন-সম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধন-সম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি; বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্বামী প্রদত্ত ধন-সম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেয়ানো সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। যদি বায়তুলমাল থেকে দেয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে, নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে দেয়া হবে।—(কুরতুবী)

وَلِكَيْ تَعْلَمَ مَا يَكْتُبْنَ إِذَا تَبَيَّنَّ وَأُجْرُهُنَّ

পূর্বের আয়াত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফের স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে; যদিও প্রাক্তন কাফের স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়।

আলোচ্য আয়াতে إِذَا تَبَيَّنَّ وَأُجْرُهُنَّ বাক্যটি শর্তরূপে উল্লেখিত হয়েছে; অর্থাৎ, তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা কাফের স্বামীকে ফেরত দেয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেয়ার আর আবশ্যিকতা নেই। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্যে বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ; কাজেই এর জন্যে নতুন মোহরানা অপরিহার্য।

وَلَا تُشْرِكُوا بِعِصَمِ الْكُرُوفِ - وَلَا تُشْرِكُوا بِعِصَمِ الْكُرُوفِ

এর বহুবচন। এর